২১ শে নভেম্বর '৭১, মুক্তিযুদ্ধের একটি উল্লেখযোগ্য দিন

এএসএম সামছুল আরেফিন

১৯৭১ সাল, বাংলাদেশ একটি রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে। '৪৮, '৫২, '৬২ এবং '৬৯ এর বাঙ্গালির স্বাধিকার আন্দোলন ধাপে ধাপে সফলতার দিকে ধাবিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৬দফা দাবী সমগ্র বাঙ্গালির কাছে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার হিসাবে বিবেচিত হয়। বেগবান হতে শুরু করে রাজপথের শোভাযাত্রা। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এক ব্যক্তি এক ভোট মেনে নিয়ে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। পাকিস্তানের কাঠামোয় অনুষ্ঠিত '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। লাভ করে সংবিধান ও সরকার গঠনের অধিকার। শুরু হয় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা হস্তান্তরের অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। সরকার গঠনের অধিকারের দাবী নিয়ে সামনে আসে পিপলস পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টো। ঢাকায় অধিবেশনের তারিখ নির্ধারিত হলেও জনাব ভুট্টোর অসহযোগিতা দেশের রাজনৈতিক পরিস্তিতিকে ঘোলাটে করে তোলে। বঙ্গবন্ধুর হাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগী জুলফিকার আলী ভুট্টো। লারকানায় ভুট্টোর বাসস্থলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টোর গোপন বৈঠক দেশের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পালাবদলের বিরোধিতায় এই প্রেক্ষাপট "লারকানা ষড়যন্ত্র" নামে অভিহিত।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তরায় বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ১লা মার্চ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে সংসদ অধিবেশন বন্ধের ঘোষণায় বঙ্গবন্ধুর ডাকে পূর্ব বাংলায় শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে পূর্ববাংলার সকল সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী অফিস ও আদালত সমূহ। বন্ধ হয়ে পড়ে প্রায় সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা। দিনে দিনে বেগবান হতে থাকে আন্দোলনের গতিধারা। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী আর মুসলীম লীগ ছাড়া প্রায় সকল দল বঙ্গবন্ধুর এই অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকাসহ দেশের সকল শহর-উপশহর মিছিলের নগরীতে পরিবর্তিত হয়। আন্দোলনের অগ্রভাগে আসে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সহযোগী বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং দেশের যুব সমাজ। দেশব্যাপী এই আন্দোলন দিনে দিনে বেগবান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত হতে থাকে আন্দোলনরত জনগোষ্ঠীর মানসিক মনোভাব। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই রাজনৈতিক আন্দোলন সময়ের প্রয়োজনে সশস্ত্র অধ্যায়ের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। নির্ধারিত হয় স্বাধীন দেশের "জাতীয় সংগীত, রাষ্ট্রীয় পতাকা এবং দেশের নাম ও সীমানা"। ২৩শে মার্চ "পাকিস্তান দিবসে" পূর্ব পাকিস্তানে শুধুমাত্র সেনানিবাস ব্যতীত সকল দালান এবং বাড়ীতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। বঙ্গবন্ধুর এই আন্দোলনের সমর্থনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ ঢাকায় তার সাথে মিলিত হতে থাকে। কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টোর অসহযোগিতায় আলোচনার ফলাফল ইতিবাচক হয়নি।

৭ই মার্চ '৭১, বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগমে মাত্র ১৯ মিনিটের এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন, সশস্ত্র প্রতিরোধ, এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে করনীয় সমন্ধে সকল বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। দেশব্যাপী শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি। শহর, গ্রাম ও মহল্লায় সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থায় এগিয়ে আসে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ। গ্রাম্য এলাকায় অবস্থিত থানার বড়বাবু রাতের আঁধারে সরকারী রাইফেল ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর বাঙ্গালী কর্মকর্তারা অনেকে গোপনে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মধ্যদিয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নানাবিধ টালবাহানা এবং বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড নিয়ে সকলের মধ্যে সাবধানতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশে কর্মরত বাঙ্গালী অফিসারগণ সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে কর্মরত পশ্চিমা অফিসারদের আচরণে সকলের মধ্যে ভীতির বিষয়টি পরিলক্ষিত হতে থাকে। সকল স্তরের বাঙ্গালী সৈনিকদের মধ্যে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ এবং তাদের দেশপ্রেমের বিষয়ে একাত্ববোধ বাঙ্গালী অফিসারদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থানরত ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটসমূহের বাঙ্গালী অফিসারগণের নিরাপত্তার কারণে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। এর ফলে তারা নিজেরাই তাদের সিদ্ধান্তে কার্যক্রম গ্রহণ শুরু করে। ইউনিটের অবাঙ্গালী অফিসারদের চোখ এড়িয়ে থাকাটাও ছিল অনেক কষ্টকর। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অবাঙ্গালী সৈন্য আনয়নের কারণে বাঙ্গালী অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে সামগ্রিক নিরাপত্তার বিষয়টি দৈনন্দিন আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অবাঙ্গালী সৈন্যদের আক্রমনের বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তায় সম্ভাব্য করণীয় বিষয়ে বাঙ্গালী অফিসারগণ মোটামুটিভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুল ভাবনা ছিল অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় ইউনিটের সৈন্যদল এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা। দেশের এই উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির অশনি সংকেতের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ সকলের কাছে একটি দিক নির্দেশনা ছিল। রাজপথে লক্ষ লক্ষ জনতার মিছিলে সর্বস্তরের মানুষের একাত্বতা বাঙ্গালী

জাতীয়তাবাদী ধারনায় নতুন একটি শক্তির জন্ম দেয়। তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা। ছাত্র-জনতার এই শ্লোগান জাতিরাষ্ট্র ভাবনার পথকে উন্মুক্ত করে। নতুন জাতীয়তাবাদের চেতনার এই মানসিকতায় পূর্ব বাংলায় কর্মরত সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙ্গালী সদস্যদের মানসিক একাত্বতা দিনে দিনে পরিলক্ষিত হতে থাকে। এমনি এক পরিস্থিতির মধ্যে আক্রান্ত হয় সমগ্র বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী।

২৬শে মার্চ '৭১। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন এক রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের মধ্যদিয়ে একটি নতুন মোড় নেয়। মধ্যরাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী অতর্কিতে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তরে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডো ইউনিট ঘেরাও করে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ী। বন্দী হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর এই স্বাধীনতার ঘোষণা রাজারবাগ পুলিশ ওয়্যারলেস এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন থানা এবং পুলিশ লাইনে প্রেরিত হয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী একই সময়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর ব্যারাকসমূহে আক্রমণ চালায়। সেনাবাহিনীর এই আক্রমণের সংবাদে দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৫টি ইউনিট বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ২৭শে মার্চ রাতে চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহ অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষনার বাণী পাঠ এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সংবাদ প্রচার করেন। বেতারে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই বিদ্রোহের ঘোষণা বাংলাদেশে অবস্থানরত সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশসহ অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেয়। অন্যান্য স্থানে অবস্থানরত সামরিক-অসামরিক বাহিনীর সদস্যরা এবং যুব সমাজ এই সেনা বিদ্রোহের সংবাদ জানতে পারে এবং নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছাত্র, যুব ও জনতার মিলিত শক্তিতে শহর, মহল্লা ও গ্রামে "মুক্তি ফৌজ" গঠিত হয় এবং তারা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। এই "মুক্তি ফৌজ" পরবর্তিতে "মুক্তিবাহিনী" নামে পরিচিত ছিল। মুক্তি সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা তাই এই 'মুক্তি' শব্দ থেকেই 'মুক্তি বাহিনী' নামের উৎপত্তি। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর সদস্য, প্যারা মিলিশিয়া ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং দেশের যুব সমাজের সমন্বয়ে এই মুক্তি বাহিনী গড়ে ওঠে। ১০ই এপ্রিল '৭১ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা এই বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক নিয়ন্ত্রনে বিজয় অর্জন পর্যন্ত পরিচালিত হয়।

মুক্তিবাহিনী গঠন

বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটসমূহ প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমনের শিকার হয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ যুদ্ধ। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে অন্যান্য বাহিনীর সদস্য এবং দেশের যুব সমাজ যুক্ত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সমন্বিত আক্রমনে একসময় এই প্রতিরোধ যুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ে এবং প্রায় সকলেই নিরাপদ আশ্রয় এবং শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে অবস্থান গ্রহণ করে। অতি দ্রুত সময়ে অফিসারগণ অন্যান্য ইউনিট সমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। ০৪ এপ্রিল '৭১ তেলিয়াপাড়ায় (সিলেট) অবস্থিত ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দফতরে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তাদের একটি সমন্বয় মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সেনাবাহিনীর অধিনায়কগণ বাংলাদেশকে ৪টি সেক্টরে বিভক্ত করে কর্নেল (পরবর্তিতে জেনারেল) এম এ জি ওসমানির নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধ সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর ১১ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের বেতার ভাষণে এই সেক্টরসমূহের ভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭ এপ্রিল '৭১ মেহেরপুরের "মুজিব নগরে" শপথ গ্রহণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে সরকার কর্নেল এমএজি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

১১-১৭ জুলাই '৭১ সেনা সদরে এক সমন্বয় মিটিংয়ে বাংলাদেশকে ১১ টি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ এবং সেক্টরের সীমান্ত নির্ধারিত হয়। এই বৈঠকে যুদ্ধের কৌশলগত দিক, বিদ্যমান সমস্যা এবং প্রতিরোধের ভবিষ্যৎ পথ বিবেচনায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সেক্টর ট্রুপস গঠন, ব্রিগেড ফোর্স গঠন, নিয়মিত অস্ত্র-রেশন-চিকিৎসা ও বেসামরিক প্রশাসনিক সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। একই সাথে ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর সাথে যুদ্ধ সহযোগিতার বিষয়টি সমন্বিত হয়। মুক্তিবাহিনীর বিভিন্নমুখী আক্রমনে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর যোগাযোগ ব্যাহতসহ বেশীরভাগ সেনা ইউনিটের কার্যক্রম শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী:

২১শে নভেম্বর '৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরো একটি নতুন মোড় নেয়। চুড়ান্ত যুদ্ধের পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সার্বিক সম্মতিতে বাংলাদেশ "মুক্তিবাহিনী" এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড "মিত্রবাহিনী" এর সমন্বয়ে একটি "যৌথ বাহিনী" গঠিত হয়। যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে: জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার এক সামরিক নির্দেশনায় সমগ্র বাংলাদেশকে ৪টি যুদ্ধ সেক্টরে বিভক্ত করে উভয় দেশের যুদ্ধরত ইউনিটসমূহকে সমন্বয় করা হয়। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সদর দফতর একইভাবে একটি নির্দেশনা জারী করে। ২১ নভেম্বর '৭১ "যৌথ বাহিনী" প্রথম যশোরের চৌগাছায় অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালনা করে। চৌগাছার সফল এই যুদ্ধে ভারতীয় সাঁজোয়া বাহিনীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই যুদ্ধ "ব্যাটেল অফ চৌগাছা" বা "চৌগাছার যুদ্ধ" নামে অভিহিত হয়ে আছে। ৩ ডিসেম্বর '৭১ পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে ১১টি বিমান ঘাঁটিতে একসাথে আক্রমণ চালায়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে পাকিস্তান বিমান বাহিনী পর্যদুস্ত হয়। শুরু হয় উভয় ফ্রন্টের যুদ্ধ। ৬ ডিসেম্বর '৭১ ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সময় থেকে বাংলাদেশের ৪টি যুদ্ধ সেক্টরে যৌথ বাহিনীর সমন্বিত আক্রমণ পরিচালিত হতে থাকে। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পনের এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খোন্দকার। এই আত্মসমর্পনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী প্রতি বছর ২১শে নভেম্বরকে আড়ম্বরের সাথে "আর্মড ফোর্সেস" দিবস হিসাবে পালন করে আসছে।

#

লেখকঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষক

১৪.১১.২০২২ পিআইডি
ফিচার